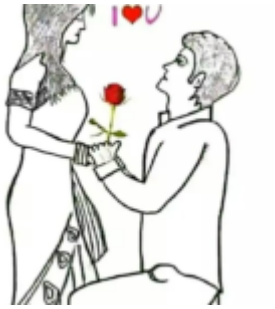

??? ???? ???? ???? ????? ??????? ?????

রাত একটা বাজে, মুষল ধারায় বৃষ্টি হচ্ছে। কোনরকম অ্যাম্বুল্যান্স ফোন করে বাসার নিচে আনলাম। তারপর ঝটপট হসপিটালে রওনা হলাম। হসপিটালে আসা মাত্রই পেশেন্টের কন্ডিশন দেখে ডক্টর অটিতে মুভ করলেন। চরম বিশ্বাসের একটা হাত স্টেচার থেকে আমার ডান হাতটি ধরে রেখেছে। ভয় হচ্ছে খুব। হারানোর একটা আতঙ্ক। আমি তাকে হারাতে চাইনা। ডক্টরকে রিকোয়েস্ট করে অটি ড্রেস পরে আমিও ভেতরে ঢুকি

। হাতটাতে পরম মমতায় আমি ধরে রেখেছি। পেশেন্ট আমার বউ। মায়াবী চেহারাটার দিকে তাকিয়ে আছি। মনে পরে যাচ্ছে এক বছর আগের স্মৃতিগুলো:-

.

নীরা আমার লাইফ থেকে চলে যাওয়ার পর আমি মানসিক ভাবে ভেঙে পরেছিলাম অনেক। শত চেষ্টাতেও ওকে আমার করে নিতে পারিনি। পৃথিবীতে একটা মানুষের এতো এতো চাহিদা থাকতে পারে কিংবা থাকা দরকার তা আমি নীরাকে ভালবেসে উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। ও যা বুঝতো সেটাই ওর মতে সঠিক। ও যা চাইতো সেটাই হওয়া উচিত ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি পারিনি ওর মতো করে সবকিছু মেনে নিতে। আমি ভালবাসতাম যতটুকু সামর্থ্য তার সমস্তটা দিয়েই। আমি চাইতাম কাউকে গড়ি আমার মতো করে, সেটা পারিনি। তারপর চেয়েছিলাম তার মতো নাহয় নিজেকে গড়ি, সেটাও পারিনি। হাজারো চাহিদা, চাওয়া পাওয়া হিসেব নিকেশের পর চরম অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিলাম নীরার কাছে। অতঃপর বিয়ে করে কানাডায় চলে যায় সে। তারপর থেকেই অনেকদিন আর নিজেকে ঘোচাতে পারিনি। ভেবেছিলাম ভালবাসা বলতে আমি যা বুঝি তা আসলে না। ভালবাসায় অর্থ, চেহারা, ক্লাস, আধুনিকতা নানান কিছুর প্রয়োজন আছে। একটা মন থাকলেই সেখানে ভালবাসা উৎপন্ন হয়না। হইলেও তা বিলাসবহুল অহেতুক চিন্তা ভাবনা। তারো অনেকদিন পর একদিন ভাগ্য বদলের সময় এসেছিল। সেদিন আম্মার চিল্লানিতে সকাল সকাল ঘুমটা ভেঙে যায়;

– রবিন! তর কি কাণ্ডজ্ঞান খোয়াই নদীতে জলাঞ্জলি দিলি?

– আম্মা কাহিনী না প্যাচিয়ে বলো কি হইছে? সকাল সকাল চিল্লানি ভাল্লাগছে না।

– এগারোটা বাজে এখনো সকাল! এই রকম দামড়া পোলা কয়টা ঘরে পালতেছে মানুষ বলতো? তকে এক সপ্তাহ ধরে বলতেছি আমার মামাতো বোনের বাড়ি যাবো ওর বড় মেয়ের বিয়ে। আমাকে পায়ে ধরার বাকি ছিল। কোনদিন যাই নাই, তদের সংসারের গ্লানি'ই টানলাম আজীবন। নিজের আপনদের আর দেখা হল না। কথা দিছিলাম ওর মেয়ের বিয়েতে যাবো। যাওয়া হইছে। আর শখ নাই ঘুমা তুই। খাওয়া আর ঘুম ছাড়া আর কি আছে তর? আমরাও কেউ না।

.

উফফ! আম্মার প্রতিদিনের নানান এপিসোডের এই ইমোশনাল অত্যাচারে অতিষ্ঠ আমি। এটা উনার একটা অস্ত্র। উঠলাম। বিয়ে শাদি হাঙি ভাঙি এসব একদম নিতে পারিনা আমি। তাও গ্রামের বিয়ে আর তারউপর ভাটি অঞ্চলের মানুষ এবং সবচেয়ে বড় কথা এটা বর্ষার মৌসুম। কল্পনা করতে পারছেন? তাও আম্মা জেদ করেছে মানে নিয়ে যেতেই হবে। উঠে ব্রাশ করে গোসল করে ফ্রেশ হলাম। নাস্তা হিসেবে দুপুরের খাবার সেরে রেডি হয়ে রওনা হয়েছি। আকাশের অবস্থা খুব একটা জুতসই না। যেকোন সময় বৃষ্টি নামতে পারে। আমি চেষ্টা করবো কোনরকম আম্মাকে উনার বোনের বাড়ি রেখে চলে আসতে। বিয়ে মিটে গেলে আবার গিয়ে নিয়ে আসবো। সিলেট থেকে সুনামগঞ্জ বেশি একটা দূরে না। দুই ঘন্টা লাগবে। তারপর নৌকা দিয়ে মিনিট বিশেক। আশা করছি ব্যাক করা যাবে। বাসে উঠলাম, আম্মা বকবক করতেছে; কি গিফট করবে, আব্বু একটা কিপটে মানুষ, টাকা পয়সা খুব একটা দেয় নাই, এই লোকটার সাথে সংসার উনি বলেই করছেন....”। এখনের পরের অংশ আমার মুখস্থ।

.

থেমে থেমে ঝির ঝির বৃষ্টি হচ্ছে। কানে হ্যাডফোন গুজে রবীন্দ্র সঙ্গীত “আজি ঝড়ো ঝড়ো মুখরো বাদল দিনে” ছেড়ে বাসের জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছি বাইরে। শীতল বাতাস বইছে। খুব একটা খারাপ লাগছে না। কিন্তু বিয়ের ব্যপারটা মাথায় আসতেই অশান্তি অনুভূত হচ্ছে। আম্মাকে রেখে এনিহাউ চলে আসা লাগবে।

সুনামগঞ্জ পৌছে গেলাম। বৃষ্টিটা নাই আপাতত। এখন ঘাটে আসলাম রিকশা নিয়ে। নৌকায় অল্প অল্প করে মানুষ নিয়ে পার করছে। বাতাসের বেগ বেশি হওয়ায় হাওরের পানি খুব ঢেউ খেলছে। বেশি মানুষ একসাথে তুললে বিপদ হতে পারে। মাত্র দুটো নৌকা। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর একটা নৌকা এপারে ভিরলো। জুতা খুলে হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি নৌকায় উঠে জায়গা দখল করলাম। আম্মাকে কোন রকম টেনে তুললাম। নৌকার গতিবেগ আর দিনের গতিবেগ চিন্তা করে বুঝতে পারছি আজকে ব্যাক করা সম্ভব না। যাইহোক, অবশেষে খাঁ বাড়ি এসে পৌছালাম। নৌকা থেকেই দেখা যাচ্ছে বিশাল বাড়িটা, বলতে গেলে হাওরের মধ্যখানে অনেক জায়গা নিয়ে বানানো। চারপাশে নারিকেল গাছ আর সুপারি গাছে ভরপুর। বাতাসে গাছের সবুজ পাতাগুলো দুলছে আর চারপাশে বিশাল হাওরের সাদা দিগন্ত। অস্থির লাগছে একদম। আমি এই এলাকায় কখনো আসিনি। এটা শহরের পেছন মুখ। এখানে দরকার ছাড়া আসে না আমাদের ওদিকের লোকজন। মনটা ভরে গেলো প্রকৃতির এই রুপ দেখে।

.

নামা মাত্রই আম্মার বোন খবর পেয়ে দৌড়ে এসে আমাদেরকে এগিয়ে নিতে এসেছেন। বাড়ির ভেতরে সবাই উঠোনে কাদা রঙ মিশিয়ে ইচ্ছে মতো গড়াগড়ি খেলছে। গ্রামের বিয়ের আগের দিন বর/কনে গোসল করানো হয় আর তারপর কাদা রঙ মাখামাখি খেলা হয়। এটা একটা ঐতিহ্য। ঘরে গিয়ে ব্যাগ ট্যাগ রেখে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। হঠাৎ কাদা মাখা একটা মহিলা এসে আমাকে বলতেছে; আপনি কে? আমি বললাম আমি কাজল...আর কিছু বলার আগেই মহিলা চিল্লায়া বলে উঠলো; এই দেখ আইসা এটা কাজলা বুবুর ছেলে! সবাই হুমড়ি খেয়ে এসে আমাকে কাদা রঙ ইচ্ছে মতো মাখালো। আমি কিচ্ছু বলিনি। মেজাজ আসমানে উইঠা আছে। আমি এজন্যই আসতে চাইনি। আম্মার উপর কি পরিমান রাগ উঠতেছে। ইচ্ছা করতেছে এক্ষুনি উনাকে নিয়ে চলে যাই। আরেকটা মহিলা বলে উঠছে দেখ দেখ কাজলা বুর ছেলেকে একদম হনুমান বানিয়ে দিছি, বলেই আকাশ পাতাল শব্দ করা হাসি। হঠাৎ বারান্দায় তাকিয়ে দেখি একটা মেয়ে আমায় দেখে হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খেতে পারছে না শুধু। আশ্চর্য ব্যাপার হলো ওর গায়ে এক ফোটাও কাদা রঙ নাই। হলুদ একটা জামা পড়া। লম্বা চুলে খুব সম্ভবত তেল করে বেণী করে রাখা। চোখ দুটো অনেকটা পেটি বিড়ালের মতো। মনে হচ্ছে ল্যান্স পরেছে। হাসিটা এতো সুন্দর ছিল যে মেজাজ অনেকটাই ঠান্ডা হয়ে গেছে। তাও আমাকে তাচ্ছিল্য করা! ওয়েট বলেই, বাঁশের নলি দিয়ে বানানো রঙ ছিটানোর একটা যন্ত্র নিয়ে বালতি থেকে রঙ নিয়ে একেবারে মেয়েটার গায়ে ছুড়ে দিলাম একদম ভিজিয়ে। এটা দেখে সবাই একদম চুপ হয়ে গেছে মেয়েটাও একদম চুপ হয়ে গেল। দেখলাম যারা আমাকে নিয়ে মজা করেছিলো, রঙ মাখাচ্ছিলো তারাই এসে ওকে অনেক বোঝাচ্ছেন; ছেলেটা তর কাজল আন্টির। কিছু মনে করিসনা মা। আমি বুঝতেই পারলাম না ওকে এতো কদর করার মানে কি?

.

কিছুক্ষণ পর একটা মগ গামছা আর লুঙ্গি নিয়ে আম্মা আসছেন। গোসল করার জন্য বাড়ির পেছনে একটা পুকুর আছে। মূলত এটা

পুকুর না। হাওরের একটা অংশ বাঁশের বেড়া করে পুকুরের একটা সেপ দেয়া হয়েছে। উপর থেকে নামার জন্য কাঠের বানানো সিঁড়ি। কাঠের সিঁড়ির উপর বসলে সামনের হাওর টার সৌন্দর্য আমি কোনভাবেই বর্ণনা করতে পারবো না। পশ্চিম আকাশের সূর্য একদম হাওরের সমান সমান, কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্ধ্যা নামবে। ঝটপট মগ দিয়ে পানি তুলে গোসল করলাম। লুঙ্গি পরে হাত পা মুছে আসলাম ঘরে।

.

ঠান্ডা লাগতেছে। বাড়িটা ছোট ছোট ঝিলমিল বাতি দিয়ে সাজানো। বাতাসে বাতিগুলো দুলছে। ভালোই লাগছে। কিন্তু রেস্ট নেয়া দরকার। এতো বড় বাড়ি অথচ প্রতিটি রুমেই ভিড় লেগে আছে মানুষের। একটা রুমে গিয়ে বসবো এমন স্পেস পাচ্ছি না। আম্মা তো বহুদিন পর মুক্তি পেয়েছে আম্মার নাগাল কে পায়? বারান্দার সাথেই একটা রুম আছে দরজা একটু চাপানো ছিলো একটু ঠেলে দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। বাহ্ এই রুমটা খুব সুন্দর। পরিপাটি বিছানা, একটা মাস্টার টেবিল, টেবিলের উপর রাখা একটা এমপিথ্রি ডিভাইস, একটা চেয়ার, একটা আলনা আর একটা পারফিউমের ঘ্রাণ। মনে হচ্ছে এটা একটা মেয়ের রুম। হোকগে, আমি একটু শান্তি পাইছি। রেস্ট করা যাবে। চেয়ারটায় বসলাম, হঠাৎ কে যেনো ভেতরে এসে দরজা বন্ধ করে দিলো। আমি পেছনে তাকিয়ে দেখি বারান্দায় দাঁড়ানো মেয়েটা যাকে আমি রঙ ছিটিয়ে ছিলাম। কিচ্ছু বললো না আমাকে দেখে। আমিও বসে আছি। মেয়েটাও টেবিলের কাছে এসে এমপিথ্রিটা নিয়ে বিছানায় গিয়ে বসেছে। ওড়নাটা গলা থেকে নামিয়ে বেডে রেখে মন দিয়ে গান শুনছে। আমি বুঝতেছি না কি হচ্ছে। দরজাটাও মেয়েটা লাগিয়ে আসছে। আমাকে কিছু বলবে নাকি? একটা গলা কাঁশি দিলাম। মেয়েটা একটু ব্রু কুঁচকালো। আবার বললাম;

– আপনি কি কিছু বলবেন আমাকে?

মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে হকচকিয়ে ওড়নাটা বুকে টেনে এনে বলতেছে;

– এই কে আপনি? এই রুমে কি করে আসলেন? কখন আসলেন?

– আশ্চর্য আপনি আমাকে দেখেই তো ঢুকলেন রুমে।

– কখন দেখলাম! আপনি জানেন না আমি চোখে দেখি না? কোত্থেকে এখানে আসছেন?

এবার সত্যি একটা বড়সড় ধাক্কা খেলাম;

– আমি রবিন। আমি জানতাম না আপনি চোখে দেখতে পাননা। আমি খুব সরি। যদি এটা জানতাম তাহলে আপনাকে রঙ'ও ছুড়তাম না। এখন জানতে পেরে খুব অপরাধ বোধ করছি। দয়া করে কিছু মনে করবেন না। আমি চলে যাচ্ছি।

.

মেয়েটা মুচকি একটা হাসি দিয়ে বলল;

– অহ্ রবিন! আরে বসেন। আসলে আমিও সরি! আমি বুঝতে পারিনি আপনি রুমে। আর রঙের ব্যাপারটা আমার অনেক ভালো লেগেছে। কেউ একজন তো ভুল করে হলেও এই আনন্দের সাথী করে নিয়েছে। আমাকে সবাই আলাদা করে ভাবে এটাতে আমার অনেক কষ্ট হয় জানেন? আজকে মনটা অনেক ভালো লাগছে। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আসলে আম্মু আপনার কথা, কাজল আন্টির কথা সবসময় বলে। আন্টি আপনাকে অনেক আদর করে তাইনা? আম্মু আর কাজল আন্টি দুজনে কিন্তু ছোটবেলার সাথী। জানেন আপনি?

মেয়েটা এতো সুন্দর করে কথা বলে ইশ! আফসোস হচ্ছে এই মেয়েটাকে সৃষ্টিকর্তা নিজ হাতে বানিয়ে ছিলেন। চোখের আলোটা দিতে খেয়াল ছিল না বোধ করছি।

মেয়েটা আবার বলল;

– কি ব্যাপার! চলে গেলেন?

– না না, আচ্ছা আপনার নাম কি?

– চাঁদনী।

– কালকে যার বিয়ে উনি আপনার বড় বোন? উনার নাম কি?

– হ্যাঁ, অর্ণি। আচ্ছা চা খাবেন? নিয়ে আসবো?

– না থাক অহেতুক কষ্ট করার।

– ধ্যাত বসুন নিয়ে আসছি। অন্ধ বলে এতোটা দূর্বল নই আমি।

চাঁদনী! কতো সুন্দর একটা মেয়ে। আম্মার মুখে শুধু শুনতাম আন্টির ছোট মেয়েটা প্রতিবন্ধী। ওরে নিয়ে আন্টির নাকি খুব কষ্ট এটা সেটা। একটা মেয়ে এতো অমায়িক, সে চোখে দেখতে পায়না শুধুমাত্র। বাকি সব কিছু সৃষ্টিকর্তা নিখুঁত করে দিয়েছেন। আর এটাকে এভাবে বিচ্ছিরি ভাবে মানুষ উপস্থাপন করে? কিভাবে!

চাঁদনী চা নিয়ে আসলো,

– আছেন?

– হুমম আছি তো। চা না খেয়েই চলে যাবো নাকি?

– হাহাহা, ঠিক আছে ধরুন।

মেয়েটা এমন ভাবে আমাকে চা'টা হাত বাড়িয়ে দিলো মনে হচ্ছে সে আমার চাইতে ভালো দেখতে পায়। স্বাভাবিক ভাবেই অন্ধরা আই কন্ট্যাক্ট কিংবা রেসপন্স করতে একটু এদিক সেদিক হয়। এই মেয়েটার মধ্যে এটা একদম নাই।

– আচ্ছা চাঁদনী। কেন যেন বিশ্বাস হচ্ছে না আপনি চোখে দেখেন না। আপনার মধ্যে একটু পরিমাণেও অন্ধত্বের জড়তা নেই। এটা কিভাবে সম্ভব?

– হাহাহা তাই নাকি? আমি পড়াশোনা করছি। তারমধ্যে সুনামগঞ্জে প্রতি শুক্রবারে একটা দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে ওখানে আব্বু নিয়ে যান। আমি প্রতিবন্ধী শব্দটার মধ্যে বন্দী হতে চাইনা।

– আপনি অনেক সুন্দর। আয়নায় কখনো দেখেছেন?

– আয়না? হাহাহা!

– সরি আসলে আয়নায় কেমনে দেখবেন। তবে চাঁদনী রাতের মতোই কিন্তু আপনি সুন্দর। এটা জানেন?

– চাঁদনী রাত! সেটা কেমন রাত?

– আরে বাবা যে রাতে সুন্দর চাঁদ উঠে ওই রাতকে চাঁদনী রাত বলে।

– আমার রাত্রিতে কোন চাঁদ এখনো উঠতে দেখিনি। সেটা দেখতে কেমন?

আমি কথা গুলিয়ে ফেলতেছি। যাই বলছি সেটা ওর দেখার প্রশ্নই আসে না।

– আপনাকে আমি দেখাবো একদিন।

– হাহাহা সত্যি! কেনো মিথ্যে সান্ত্বনা দিচ্ছেন রবিন? আর হ্যাঁ আমাকে আপনি তুমি করে বলতে পারেন। আমরা সমবয়সী।

– আচ্ছা ঠিক আছে। আর হ্যাঁ মিথ্যে সান্ত্বনা আমি কাউকে দেইনা। তুমি বলছো না প্রতিবন্ধী শব্দটাতে বন্দী থাকতে চাওনা? চাইলেই মনের চোখ দিয়ে সব কিছু দেখা সম্ভব। আমি আমার বাস্তব চোখের চাইতে মনের চোখ দিয়ে বেশি দেখতে পারি। যা চাই তাই দেখি। তুমিও পারবা।

– খুব সুন্দর কথা বলো তুমি রবিন।

– তুমিও। আমার অনেক ভালো লাগলো তোমার সাথে পরিচিত হয়ে। আমরা কিন্তু আজ থেকে ভাল ফ্রেন্ড হতে পারি।

– হাহাহা করুনার গন্ধ পাচ্ছি।

– পৃথিবীর সব মেয়ে মানুষ কি একরকম? উল্টোটা আগে বুঝবে? ঠিক আছে ফ্রেন্ড হওয়া লাগবে না। আম্মা হয়তো খুঁজতেছে উঠলাম।

– এই রবিন! আরে মজা করে বলছি তো। শোনো...

.

চলে এসেছি। আমার এই সমস্যাটা আছে খুব। আমাকে কেউ সন্দিহান হয়ে পিন মেরে কথা বললে ভাল্লাগে না। শরীর জ্বলে। পরের দিন অনেক জমজমাট করে নৌকা দিয়ে বিয়ে হয়েছিল অর্ণি আপুর। বিদায় বেলায় চাঁদনী মেয়েটা সবচেয়ে বেশি

কেঁদেছিল। বারবার বলতেছিল; আজ থেকে আমি একা হয়ে গেলাম বুবু।
মেয়েটার জন্য আমারো খুব কষ্ট হচ্ছিল। বিয়ের শেষে বিকেল বেলায় চাঁদনীর রুমে গেলাম। ওকে খুঁজে পেলাম না। পরে বাড়ির পেছনে পুকুরের সিঁড়িতে গিয়ে পেলাম। মন খারাপ করে বসে আছে। কাছে গিয়ে বসলাম;
– ম্যাডামের কি মন খারাপ?
– নাহ্ মন খারাপ হবে কেনো?
– এই যে অর্ণি বুবু চলে গেল।
– চলে তো যখন তখন সবাই'ই যায়। এ আর নতুন কি?
– হাহাহা। গতকাল তুমি বারবার করুনা করুনা করছিলা ক্যানো? আমার এসব ভাল্লাগেনা। আমি যা বলি সত্যটাই বলি। তোমাকে দয়া কিংবা করুনা করার কোন অপশনই নাই চাঁদনী। মাত্র এক দিনের পরিচয়ে তোমাকে আমার মনে হয়েছে তুমি আলাদা, ইউনিক, তুমি সুন্দর, তুমি ব্যাতিক্রম। তোমার সাথে সারাজীবন কাটানো যায়। তোমাকে করুনা করা যাবেনা। তোমাকে ভালোবাসা যাবে।
– রবিন! আবার??? হাহাহা, খুব চালাকি হচ্ছে তাইনা?
– না তাইনা। আমি একটা ডিসিশন নিয়েছি চাঁদনী।
– কী?
– আমি তোমার সাথে প্রেম করবো।
– রবিন তুমি বোধহয় এখন একটু বেশিই করে ফেলছো। আমি তোমার সাথে মিশেছি তাই বলে এটার সুযোগ নেয়ার চেষ্টাটা তুমি করতে পারোনা। আমি এটা ভেবে মিশিনি। আমি একাই ভাল আছি।
– চাঁদনী আমি তোমার সাথে প্রেম করবো আর সেটা বিয়ে করে তারপর করবো। তোমাকে আমি করুনা করিনি। এই ব্যাপারটা তোমাকে প্রমান করে দিবো। চলে যাচ্ছি আমি বাড়িতে। আবার আসবো। একদম বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে, তাও সন্দেহ থাকলে না করে দিয়ো। ফিরিয়ে দিয়ো, কিন্তু এটা বইলো না করুণা করছি।

.

বাড়ি চলে আসছি। মেয়েটাকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারছি না। ওর কথা ওর চোখ, চুল, হাসি সবগুলোই আমাকে দূর্বল করে দিচ্ছে। ক্যানো জানি মনে হচ্ছে একেই আমার দরকার। যার চোখের আলো না থাকলেও সৃষ্টিকর্থা একটা মন দিয়েছেন। যার মনের চোখ এই বাস্তব চোখের কাছে কিছুই না। আমি পরদিন আম্মাকে বললাম;
– আম্মা চাঁদনীকে কেমন লাগে তোমার?
– ফুলের মতো মেয়েটা। একদম আমার মামার মতো হয়েছিল। কিন্তু দেখ কপাল কি। মেয়েটা প্রতিবন্ধী।
– আম্মা! চোখে দেখে না মানে ও প্রতিবন্ধী না। আর মেয়েটা অনেক বুদ্ধিমতী আর লক্ষ্মী।
– কি বলতে চাস?
– আমি ওকে বিয়ে করতে চাই আম্মা। তুমি আন্টির সাথে কথা বলো।
আম্মা আকাশ থেকে পরেছিলো সেদিন। কান্নাকাটি করে বলেছিল একটা অন্ধ মেয়েকে বিয়ে করবি? কই এতোদিন তো বিয়ে কর বিয়ে কর বলে অতিষ্ঠ হয়ে গেছিলাম আর আজকে একটা প্রতিবন্ধী মেয়েকে..."? আমার নাতি নাতনি পর্যন্ত অন্ধ বানাতে চাস?
আমি আর অপেক্ষা করিনি। দুদিন পরেই চলে যাই সুনামগঞ্জ। একদম হাতে পায়ে ধরে আন্টিকে রাজি করালাম। আন্টি আমার প্রতিই বেশি আফসোস দেখাচ্ছিল। আর বলতেছিলো; তুই ক্যান বাবা এই ডিসিশন নিলি? ভেবে নিয়েছিস? আমি বললাম ভাবছি। আমি ওকেই চাই। তার পরের সপ্তাহেই একদম ছোট পরিসরে বিয়েটা সেরে ফেলি। এটা একটা রহমত, বেশি বাজিয়ে বিয়ে করলে নাকি আল্লাহ বেশি খুশি হননা। বেশি ঝামেলা আর শয়তান আছর করে। বাসর রাতে চাঁদনীর অনেক মন খারাপ ছিল। আমি ওকে প্রপোজ করেছিলাম। ও অভিমানের স্বরে বলেছিলো; ভেবে দেখি। আচ্ছা তুমি শিক্ষিত মানুষ। তুমি এই ভুলটা কেনো করলা রবিন? তোমার লাইফটা তো আরো সুন্দর হতে পারতো।

আমি বলেছিলাম আমি তোমাকে অর্জন করেছি চাঁদনী। আমার মনে হয় আমি আমার আসল জীবন সঙ্গিনী পেয়ে গেছি। তুমি আমাকে চাও না?

চাঁদনী সেদিন বলেছিলো; আমিতো সেদিন থেকেই তোমাকে চাইছিলাম রবিন। যে কিনা আমার মনের চোখ দিয়ে পৃথিবীর সৌন্দর্য দেখাবে। আমার প্রথম চাওয়া একজন মানুষ। কিন্তু আমি তো তোমার যোগ্য ছিলাম না। আমি বলেছিলাম; তুমিই আমার যোগ্য ছিলা চাঁদনী। শুধু খুঁজে পেতে আমি দেরি করে ফেলেছি।

আমার শহরে একটা জব হয়। ওকে কাছ ছাড়া করিনি।

.

এরপর থেকে চাঁদনী আর আমার সুখের সংসার শুরু। সবাই ওকে অনেক আপন করে নিয়েছিল। ওকে আমি চুল আছড়ে দিতাম। শাড়ি পরিয়ে দিতাম। মেহেদী লাগিয়ে দিতাম। ওর কোন অভিযোগ ছিলনা। কোন বিশেষ চাহিদাও ছিলনা। আমার লাইফে ওর ভালবাসা এতো পরিমাণে পেয়েছিলাম যা ভাবা যায়না। কারো জীবনের প্রথম আর শেষ মানুষ হওয়াটা কতটা ভাগ্যের জানেন? যেখানে এই পৃথিবীর নিকৃষ্ট কোন চাহিদা নেই। যাকে আমার আত্মার সাথে বেঁধে আমার মতো করে সাজানো যায় এখানে আর কি চাই? দৃষ্টিশক্তিটা এখানে খুবই তুচ্ছ খুবই। আমার সুখের সংসার চাঁদনী আলোকিত করে রেখেছিল। কয়জন পারে এই সুখটা অর্জন করতে? হয়তো মানুষ তাচ্ছিল্য করবে আমাকে। মানুষের ধর্মই এটা। এদের মনোরঞ্জন পুরো করা কি আমার সাধ্য আছে? এসব ভাবিনা।

.

একবার ফুটবল বিশ্বকাপের সময় আমি বলেছিলাম;

– চাঁদনী তুমি কোন দল করো? ব্রাজিল নাকি আর্জেনটিনা?

– তুমি কোনটা আগে বলো?

– আমি বলছিলাম; আমি ব্রাজিল।

– ও অনেক উৎসাহ নিয়ে বলেছিলো; আমি তাহলে তো আর্জেনটিনা।

তারপর থেকে আর্জেনটিনার জার্সি পরে আমার বুকে জড়িয়ে খেলা শুনতো। আমি পরতাম ব্রাজিলের জার্সি। আর্জেন্টিনা জিতলেও খুশি আবার ব্রাজিল জিতলেও খুশি। আমার মনে হতো আর্জেন্টিনা আর ব্রাজিল দ্বন্দ্ব পৃথিবীতে আর নাই।

একদিন ওরে নিয়ে ছাদে গিয়েছিলাম চাঁদ দেখতে। ও বলতো;

– আচ্ছা জান চাঁদ কেমন দেখতে?

– গোল।

– গোল কেমন?

– আরে ফুটবলের মতো আরকি।

– ফুটবল আবার কেমন?

– চাকার মতো যে? ওরকম?

– চাকা জানি কেমন?

অনেক ভেবে ওর আঙ্গুল দিয়ে ছাদের ফ্লোরে গোল করে এঁকে দেখাতাম। রঙ কেমন, আকাশ কেমন, সে দেখতে কেমন, পানি কেমন প্রতিদিন আমাকে এসব বোঝাতে হতো। মোটেও ক্লান্ত নই আমি। সেটাই চেয়েছিলাম। আমি ওকে গল্প শুনাতাম। বিভিন্ন ধরনের গল্প। যে গল্পের নায়িকাদের চোখের আলো দরকার ছিল না সেসব গল্প। চাঁদনী আমায় ভালোবাসে জড়িয়ে ধরতো।

.

হঠাৎ কান্নার আওয়াজে কল্পনা থেকে বের হলাম;

– কনগ্রাচুলেশানস মি. রবিন! আপনি বাবা হয়েছেন।

– আলহামদুলিল্লাহ্! চাঁদনী কেমন আছে ডক্টর? কোন সমস্যা নেই তো? কখন জ্ঞান ফিরবে?

– সি ইজ আউট অফ ডেঞ্জার নাউ। ঘন্টা দুয়েক পর জ্ঞান ফিরবে। ডোন্ট ওয়্যারি।

– থ্যাংকস ডক্টর।

আমার একটা ফুটফুটে মেয়ে হয়েছে। প্রথম বেবি গার্ল হওয়াটা নাকি রহমত। অনেক শুকরিয়া আমি। একদম চাঁদনীর জেরক্স কপি। আম্মা তারা সবাই সাই সাই করে আসতেছে। আম্মা ফোনে কয়মিনিট বকেছে জানিনা। শুধু যেনো উনার নাতনির আর বৌমার কোন অযত্ন না হয়। একটু পর আবার চাঁদনীকে বুঝাতে হবে আমাদের মেয়েটা কার মতো দেখতে হয়েছে। চাঁদনী ঘুমাচ্ছে। আমরা বাপ মেয়ে পাহারা দিচ্ছি। ভোরের পাখির কিচিরমিচির শব্দ শোনা যাচ্ছে। নতুন একটা সকালের অপেক্ষা। পবিত্র ভালবাসার সকাল